সাপ্তাহিক
বিচিত্রা
২৫ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২৯ ফেব্রুয়ারি '৯৭/৯ফাল্গুন ১৪০৩

গণ সংগীতের রূপকার সাধন সরকারের স্মৃতিচিত্র

আবুবকর সিদ্দিক

সাধন সরকারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত পরস্পরকে চ্যালেঞ্জের সংঘাত ছুঁড়ে দিয়ে। তখন আমি দু'বছরের কলেজ মাস্টার। বরিশালের চাখার ফজলুল হক কলেজ ও খুলনার দৌলতপুর বি.এল কলেজে গলা পাকিয়ে ১৯৫৯–এর ৬ অক্টোবরে বাগেরহাট পি.সি. কলেজে জয়েন করেছি। ১৯৬০ সালের মে মাস। খুলনা শহরে সরকার স্যুইটসের মালিক ব্রাদার্সের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মংগল ওরফে অমর কুমার সরকারের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে দিন দুই হল 'ধর্ম সভা রোডে ওদের বনেদী দোতলা বিল্ডিংয়ের নিচ তলায় উত্তর দিকে একটা ক্ষুদে কামরায় ঠাঁই পেড়েছি। মংগল যে ১৯৫০–এ বাগেরহাট টাউন স্কুলে আমার সহপাঠী ছিল, সে স্মৃতি বহু আগে মন থেকে মুছে সাফা হয়ে গিয়েছিল। আমার উৎসাহী পিতৃদেবই এসব হারানো লতাপাতা খুঁড়েখুঁড়ে বের করে আনেন। সেই পঁয়ত্রিশ বছর আগে 'প্রফেসর' শব্দটায় তখনো শ্যাওলা পড়তে পারেনি। অর্থাৎ মংগলের প্রত্যয় ছিল, ওর বিয়েতে একজন 'প্রফেসর–বন্ধু'র জেল্লা বাড়াবে। সকালে সরকার স্যুইটসের লুচিতরকারি সরপুরিয়া, দুপুরে ঘীভাতে মাছ তরকারি দই মিষ্টি আর বসে বসে কবিতা লেখা, গান লেখা, বই পড়া; বেড়ে মজায় দিন কেটে যাচ্ছে।

বাঁ থেকে লেখক ও সাধন সরকার

মাঝে মাঝে মংগল তার দু'চারজন বন্ধুকে ধরে এনে আলাপ করিয়ে দেয় (ইন্সিওরেন্সের রসময় বাবু ও বি. এল. কলেজে আমার পুরনো ছাত্র মৃণাল কৃষ্ণ বনিকের মুখ দুটি মনে আছে। এখন যেখানে ডাঃ মানাফের ডিস্পেন্সারী, ওটাই ছিল মৃণালদের বাড়ি)। একদিন এক ভদ্রলোক এসে গ্যাঁট হয়ে জমে গেছেন। আর ওঠার লক্ষণটি নেই। ফরাসী চিত্রকলার উপর একটা বই পড়া চলছিল। বই মুড়ে রেখে প্রতীক্ষা করছি তাঁর সদয় প্রস্থানের। মানিক, বিভূতি ভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ী, অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, প্রমথেশ বড়ুয়া, সুধীরলাল চক্রবর্তী, পংকজ মল্লিক, জগন্ময় মিত্র, সায়গল, হেমন্ত মুখার্জিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েন তিনি। বর্ডার ক্রস করে পূর্ব পাকিস্তানের চৌহদ্দীতে ঢুকে পড়ার উপক্রম মুহূর্ত। আমিও বই পড়ার টান কাটিয়ে জমে গেছি দিব্যি। কিন্তু এবারে সুর পালটে যেন কিছুটা ত্যাড়া দিকে চলে যান ভদ্রলোক। বলেন, 'ঢাকায় পড়াশোনা করেছেন বলে 'সমকালে' আপনার কবিতা ছাপা হচ্ছে। বাগের হাটে বসে জীবনভর ভাল কবিতা লিখে গেলেও কাজ হতো না।' রপ গরম হয়ে ওঠে ছাব্বিশ বছরে যুবক অধ্যাপক আমার। মফঃস্বলী গুমর বলে একটা নরমগরম উপকেন্দ্র ছিল শরীরে। বর্ডার ক্রসের প্রথম পদক্ষেপে সেখানেই জুতোর ঠোক্কর লাগিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। এবারে বেশ খেদ নিয়ে বলেন, 'কলকাতায় থাকলে সাধন সরকারও আজ রবীন্দ্র সংগীতের টপ আর্টিস্টদের একজন হয়ে উঠতো।' কে এই সাধন সরকার? দেখিনি কখনো। নাম এই প্রথম শোনা। এবং শ্রবণ মাত্রেই পরিবেশনের গলদে আমার অদৃশ্য অপ্রিয়জনে পরিণত হয়ে গেলেন। 'সাধন বাবুর বাঁশিও শুনতে হবে আপনাকে। গান তো শুনবেনই।' সমঝদার ভদ্রলোক অনেক কথা সরল মনে আউড়ে চলেন। আমার ঔৎসুক্যে বরফজল পড়ে গেছে ততক্ষণে। তিনি বলে চলেন, 'নিন তৈরি হয়ে নিন। এখুনি নিয়ে যাবো আপনাকে। সাধন বাবুর বাড়ি তো কাছেই হেঁটে চলে যাবো।' চাপা রোয়াবী গলায় বলি আমি, 'চিনিনে জানিনে আমি যাবো কেন তাঁর বাড়িতে? তাঁকেই বরং নিয়ে আসুন।' চোখ ভরা বিস্ময় ও সংশয় নিয়ে মনে হয় আমাকে মাপার চেষ্টা করেন তিনি 'আচ্ছা আসছি তাহলে।' বলে কোঁচা গুছিয়ে স্যান্ডেল টেনে চলে যান। আধ ঘন্টাও চোকেনি। মংগলের বড় বৌদি উপর থেকে আম কেটে পাঠিয়েছেন। খেতে খেতে বই পড়ছি। ভদ্রলোক আবার হাজির। 'চলুন আপনাকে যেতে হবে। সাধন সরকার বসে আছেন।' 'বাঃ! যেতেই হবে?' 'আপনি বুঝছেন না, আপনাদের দেখা হওয়ার দরকার। আমার একান্ত ইচ্ছে–।' আমার সৌজন্যবোধে চাড় পড়ে এবারে। তবু গড়িমসি করি, 'চানটা সেরে নি আগে। আপনি আম খেতে লাগুন।' ভদ্রলোক বেগে মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, 'এসে পড়বে এখন। বুঝলেন কিনা, সাধন বেরিয়ে যাবে মায়ের পুজোর জিনিস কিনতে। আপনি না গেলে তো নামতে পারছে না। আমি বসিয়ে রেখে এলাম প্লীজ।' অগত্যা বেরিয়ে পড়তে হয় তাঁর সঙ্গে।

মংগলের বাড়ি থেকে কয়েক কদম হেঁটে মীর্জাপুর রোড। পথের পশ্চিম পাশে একেবারে মুমূর্ষু দশার ছোট একতলা। নোনা ধরা ইটের দাঁত বেরিয়ে আছে। সামনেই সামান্য ফালি বারান্দা নামে। ডান হাতে একটি পকেট কামরা। পাঁচ ফুট বাই আট ফুট হবে মনে হচ্ছে। শুধু একটা সস্তা পাটি। একটা পুরনো সিংগল রীডের হারমোনিয়াম, রং চটা। দুটি একটি ছবি। এই মাত্র সম্বল ও ঘরের। চটি বাইরে রেখে ভেতরে ঢুকে বসে পড়ি। ভদ্রলোক শোবার ঘরে ঢুকে গিয়ে গৃহকর্তাকে ডেকে আনেন। তাঁকে এক নজর চেয়ে দেখি। কোনো চাঞ্চল্য বোধ করি না আমার স্নায়ুতে। বড় একমেটে এই সাক্ষাৎকার। আমার দিকে চোখ

পরবর্তী পৃষ্ঠায় ⟶

তুলে না তাকিয়ে প্রথম বাক্যটিতে প্রশ্ন নিক্ষেপ করেন তিনি 'মংগলের সাথে কবে পড়িছেন? ও কি পাশ করিছিলো ম্যাট্রিক?'. কতকটা ঘাড়গোঁজা সুমগ্ন ভংগিতে কথা বলেন দ্বিতীয় পক্ষের প্রতি রেয়াৎ না দিয়েই। খুব দমে যেতে হয় আমাকে। লুঙ্গি পরা খালি গা। খাটোখোটো মেদল দেহ। ভারী কাঁধ। ঘাড় গোঁজা। বড় মাথা। ফর্শা পিঠে ঘামাচি ছড়িয়ে। কালো কড়া গোঁফ, অপলক গোল্লা চোখ, বাজখাঁই গলা; সব কিছু ভরে একটা প্রকাশ্য শ্লেষের জানান। ইনি শিল্পী? তবু কথা এগিয়ে চলে কবিতা গান লেখালেখি নিয়ে। আমি বলি, 'ইস্ট পাকিস্তানে আজকাল যা অবস্থা মডার্ন সঙের। আমি তো শুনিই না রেডিও টেডিও।' সাধন বাবু জানতে চান কারণ। আমি উত্তর দিই, 'শালীন একটা গলাও তো শুনতে পাই না। যেমন গানের গায়ক, তেমনি তার সুর!' সাধন বাবু পর্দা ঈষৎ চড়িয়ে বলেন, 'আরে মশাই, সুর দিয়ে খাটা খাবে আর্টিস্ট? মনের কথা না পাল্লি সুরডা বা'রোচ্ছে কিসির মধ্যি দিয়ে?' আমি আরেকটু চেতে যাই, 'ভাল কথা দিয়ে ফায়দাটা কী? সুর যদি অর্থ বুঝে জায়গামত লাগাতি না পারে, তাহলি তো সবটা মার্ডার হয়ে যাবে।' 'হুঁঃ, জায়গামতন! জা'গামত কথা ফেলে দিয়ে দেহিছেন কহোনো? ঠিক ঠিক কথা দেন, কায়দামত সুর অটোমেটিক লাফ দিয়ে ওঠফে।' 'ঠিক?' 'তাই ন্না তো কী? ঠিক।'

সাধন বাবু তাঁর মনের নির্দোষ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। কী আশ্চর্য! আমি অপমানিত বোধ করি কেন? প্রচন্ড একটা রোখ নিয়ে মংগলের ঘরে ফিরে আসি। আমার যৌবনতপ্ত ইগোতে হুল ফুটিয়েছেন তিনি। জবাব– হ্যাঁ, দাঁত ভাঙা জবাব দিতে চাই উদ্ধত দাম্ভিক লোকটাকে। পূর্ব পাকিস্তানে গীতিকার হিসেবে কোনো পরিচয় নেই আমার। গান লিখি নিছক আপন মনের অতি একান্ত গোপন টানে। এ দেশে তখন আধুনিক গানের গায়ক হিসেবে স্কুলের সহপাঠী বন্ধু নাসির হায়দার, গীতিকার সহপাঠী বন্ধু আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও সুরকার হিসেবে আবু বকর খান, এই পছন্দসই। আমার লেখা গানের প্রথম সুরকার নাসির হায়দার। গান দুটি হলঃ 'বউল বনে ফাগুন বেলা বাজল বধুর বাঁশি' ও 'তমাল তনুটি ঘিরে/ প্রথম শ্রাবণ ঝরিল যে হায়/মরণের তার চিরে' (দুটি গানেরই রচনা তারিখ ১৯.৬.১৯৫৭)। সাধন বাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে পর্যন্ত প্রায় দু'শোর উপর গান লেখা হয়ে গেছে। সুরকারদের মধ্যে আখতার সাদমানি, ডঃ গোলাম মোস্তফা, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, ওস্তাদ শুকলাল চক্রবর্তী, নীরোদ নাথ, সিতাংশু রায়, শরদিন্দু দেবনাথের নাম মনে পড়ছে। এই পুঁজি নিয়ে আমি ভিতরে ভিতরে তড়পাতে শুরু করেছি সাধন বাবুর তাচ্ছিল্যের জবাব হানবার জন্যে (ঐ ঘটনাটির পঁয়ত্রিশ বছর পর আজ তখনকার সেইসব গানের কিছু কিছু পান্ডুলিপি, যার বেশির ভাগই একাত্তরের তাড়নায় খোয়া গেছে, ঘাঁটতে গিয়ে লজ্জায় কুঁকড়ে যেতে চাইছে মন। বালখিল্য, দুর্বল, স্টিরিওটাইপড় সব রচনা!)।

মংগলের বাড়ি অবদি পৌঁছুতে পৌঁছুতে অসুস্থ হয়ে পড়ি আমি। শারীরিক নয়, মানসিক। বুকের মধ্যে– মাথার মধ্যে বিপর্যয় কান্ড চলেছে। যেন বাগেরহাট লাইট রেলওয়ের এঞ্জিন দাবড়ে নিয়ে ছুটছে পাগলা ড্রাইভার। স্নান ঘরে গিয়ে মগ দিয়ে জল ঢালছি গায়ে, গানের কথারা তোড় ধরে শত ধারায় বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে চতুর্দিকে। খেতে বসে অন্নব্যঞ্জনের স্বাদগন্ধ স্পর্শহীন হয়ে মিলিয়ে যায় গলার তলায়। কোনো মতে মুখ হাত ধুয়ে মুছে চেয়ার টেবিলে বসে যাই কাগজ কলম নিয়ে। একটা ফলস্ক্যাপ কাগজে চারভাজ করে চারপিঠে চারটে গান লিখে ফেলি ৯, গড় করে। চার রকমের চারটে গানঃ 'আমি বাতাসে দিলেম পাঠায়ে আমার গান।/তুমি প্রবাসে বসিয়া ভরিয়া নিয়ো গো প্রাণ।', 'প্রেম মোর কালজয়ী জানি।/মরণেও ক্ষয় নাহি মানি।', 'তোমারে পেয়েছি তাই মিটেছে মনের সব সাধ।/স্বপনে দিল কি ধরা দুর্লভ দূর মায়া চাঁদ।' এবং একটি সরস্বতী স্তোত্র– 'তুঁহু মেরা মুকতা ম্যায় তেরী শুক্তি।'

কী ছেঁদো অভিসন্ধি আর ছেলেমানুষী উল্লাস! ঠ্যাটা সাধন সরকারকে বাজিয়ে নেবার জন্যে চারটে হাতে গরম গানের পান্ডুলিপি নিয়ে বেলা দুটোর দুপুর রোদ্দুর মাথায় করে ছুটেছি মীর্জাপুর রোডে। দরোজায় কড়া নাড়তেই বেরিয়ে এলেন তিনি লুঙ্গি আর খালি গা। গালে পান। 'কী ব্যাপার, আবার? বাগেরহাট ফিরে যাতিছেন নাকি?' 'না, একটু বসতি হবে'। সে 'তা না হয় বসলাম।' সেই ঘরটাতে বসার পর পকেট থেকে কাগজ বের করি আমি। হাতে নিয়ে চোখ বুলোতে বুলোতে বলে ওঠেন, 'এ কেসটা কী কনদিনি? সব তো আজকের তারিখ দেখতিছি!' 'এখনই লিখে এনেছি। সুর করুন দেখি।' 'বাহ! বহুৎ রোখ!' বলতে বলতে হঠাৎ শিশুর মত হেসে ওঠেন তিনি। নজর নিবদ্ধ প্রথম গানটিতে। হারমোনিয়াম কোলে টেনে নিতে নিতে একবারটি আকান আমার দিকে। সে চোখে ঘন কোমল মায়া। ফিক করে আত্মগত হাসি হাসেন। সে হাসিতে নিষ্পাপ পদ্মপাতা। চোখ দুটি মুদে অর্ধস্ফুট গলায় গুন গুন করে শ্যামকল্যাণে আলাপ ভাজতে শুরু করেন। হারমোনিয়াম বেজে চলেছে সেই সঙ্গে। একটু পরেই সুস্পষ্ট শব্দরূপ পেয়ে যায় গুঞ্জনধ্বনিঃ 'আমি বাতাসে দিলেম পাঠায়ে...!' কোথায় পালিয়ে গেছে সেই হেঁড়ে গলার শ্লেষ ভরা ত্যাড়া আওয়াজ! মন পাগল করা এক ধরনের বশীকরণ আওয়াজ আছে না কোনো কোনো কণ্ঠে, তার কুন্ডলীপাক বেড়ে উঠতে উঠতে কাঁপিয়ে তুলেছে ছোট্ট কামরাটুকু। প্রণয় ও বিরহ, মাধুরী ও শোক; ঝুরে ঝুরে মরছে দক্ষিণের দরোজা ও পুবের জানালার চৌকাঠে। আস্থায়ী থেকে অন্তরাঃ 'কুলায়–পিয়াসী সন্ধ্যা পাখির সুরে।/ আমার বাণীটি যায় ভেসে দূরে দূরে।' আশ্চর্য, অন্তরা থেকে অবলীলায় সঞ্চারীতে নেমে আসে জোয়ারী কণ্ঠঃ 'এরই নাম প্রেম আধো দেখা আধো শোনা/ নয়নের জলে পথ চেয়ে দিন গোনা।' কোটালের জল যেমন ঘাটের সিঁড়ি ছোঁবার জন্যে কুল কুল করে কেঁদে মরে অন্ধকারে, তেমনি আমার প্রাণটাও তাঁর পায়ের কাছে আকুলি বিকুলি করে কেঁদে মরছে। কোনো মকশো নয়, নয় কোনো প্রিমেডিটেশন, দ্বিতীয় অন্তরা শুরু হয়ে গেছে স্বতঃস্ফূর্ত গতিতেঃ 'ভিড়বে এ গান তোমার ঠিকানাতেই/ হয়তো তখন আমি আর নেই নেই...!' গান শেষ হয়ে গেছে। সাধন বাবুর মুখে তৃপ্তির আলো ভাসানো হাসি। আমার চোখে পাতা ভাসানো জল। শিল্পী হেসে বলেন, 'কী, হলো তো?' কোনো কথা না বলে সালামটি দিয়ে ভারী বুকে চলে আসি। পিছন থেকে বলেন তিনি, 'ট্যুইশনিখে আ'সে বাকি তিনটেও সা'রে ফেলবানি।'

এভাবেই আমাদের অচ্ছেদ্য প্রণয় সম্পর্কের সূত্রপাত ও সহযোগের শুভ যাত্রা। সাধন বাবুর সঙ্গে আমার এই যোটক জোয়ার নিয়ে আসে আমার গান রচনার ধারায়। কত অসংখ্য এবং বিচিত্র গানের কথা ও সুর নিয়ে যে আমরা দু'জনে ঐ মিনি কামরাটিতে বসে পরীক্ষা–নিরীক্ষা চালিয়েছি, তার সত্যিই হিশেব নেই, মানে হিশেব রাখার কথা কোনো দিন খেয়ালে আসেনি। খুলনায় এসে উঠতাম মেজ বোন জানুর বাসায়। ওদের বাসা খুলনা শহরে বার বার ঠাঁই বদল ঘটিয়েছে। সেই ১৯৬৩তে এক নম্বর কাস্টমঘাট লেন থেকে শুরু করে টুটপাড়া, বয়ড়া, ইকবালনগর হয়ে এখন দুই নম্বর কাস্টমঘাটে এসে থিতু হয়েছে বছর পনেরো হবে। ১৯৬৪–এর সেপ্টেম্বরের পর থেকে মাঝে মাঝে থেকেছি গুরুর (শহীদ খালেদ রশীদ) মেসে, কখনো বা আজম খান কমার্স কলেজের টিচার্স মেসে বন্ধু মুস্তাফিজ বা সুজার (খন্দকার শাফায়েত হোসেন) সঙ্গে, কিছুদিন বা হাসান আজিজুল হকের বাসায়। যেখানেই থাকি না কেন, সকালের দিকে নাস্তাটি সেরে রিকশা নিয়ে চলে আসতাম মীর্জাপুর রোডে। আগের দিনের গানের আধাসমাপ্ত বা সদ্যে সমাপ্ত সুর নিয়ে বসে যেতেন সাধন বাবু। অথবা নতুন লেখা গানের কাগজ পকেট থেকে বের করে হারমোনিয়ামের ডালার উপর মেলে ধরতাম। একটা আলো ভরা হাসি ছিল তাঁর। সেই হাসি ফোকাসের সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো লাফিয়ে উঠতো। একই গানের উপর কত রকম সুরের কসরত না চলতো! কয়েকটি মাত্র লাইন নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে যেতো। যতবার আমি 'না না' করে চেঁচিয়ে উঠি, ততবারে তিনি

চলছে →

ছড়িয়ে দেয়া সুরের গুটলী গুটিয়ে ফের আবার গোড়ায় ফিরে আসেন। নতুন করে শুরু হতো সুর বসানোর লড়াই। আমার 'কথা'য় আমার নিজের একটা 'অর্থ'– পরিকল্পনার গুনগুনানি কাজ করতো মনে মনে। অসম্ভব-সুন্দর সুরে দরদ ঢেলে সুরকার এগিয়ে চলেছেন নিজের মেজাজে। কিন্তু না রেলের একটা লাইন কখন যেন অন্য লাইনটাকে পাশ কাটিয়ে চলতে শুরু করেছে, সমান্তরালে নয়, ঈষৎ বেঁকে। ঝপ করে বেলোতে হাত চাপা দিই আমি। নতুবা গুম করে কিল বসিয়ে দিই গায়কের পিঠে। 'বদরাগী' বলে কথিত মানুষটি শিশুর মত ফক করে হেসে দিয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে বলতেন, 'অ'তিছে– অ'তিছে! ধরেন তয় আবার।' আর সাগরেদ তবলচি গৌরীশংকর বাঁয়ায় 'ঘোউম' করে বাঁ হাতের চেটোয় থাবড় কষিয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বহুৎ আচ্ছা!' দরোজার বাইরে বারান্দায় সাধন বাবুর বৃদ্ধা জননী বসে বসে শুনছেন। তাঁর নাতি শিশু নাড়ু আমার বিদ্যাসাগরী চটির লাল ডগা চিবুতে লেগেছে। ১৬.৪.৬৪– এর রোদ ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে মেঘমল্লারের রেওয়াজ চলছে ঘরের মধ্যে। আগের দিনে লেখা একটি রাগ প্রধান গানের মাথার উপর লিখে দিয়েছিঃ 'রাগ।।। মেঘমল্লার বা মিয়া কী মল্লার বা সুরদাসী মল্লার। কিছুক্ষণ আলাপ করে গলা খোলার পর সাধন বাবু আস্থায়ীর বোলে চলে এলেনঃ 'নেচো না ময়ূরী ওগো বাদল দিনে/ মরমে সহে না সুখ বঁধুয়া বিনে।' এই 'বিনে'তে এসে আমায় কাঁদিয়ে ছাড়লেন। বুকের মধ্যে প্লাবনজল পাড় ভেঙে ধসিয়ে নিয়ে চলেছে। আমি শিল্পীর কাঁধ জাপটে ধরে হাউ মাউ করে কাঁদছি। সাধন বাবু অপত্য প্রশ্রয়ে হাসতে হাসতে অন্তরা স্পর্শ করেন এবং তারপর গম্ভীর মুখে গুম গুম বুলন্দ আওয়াজে সঞ্চারী লাগানঃ 'কেন এ ঘন ঘন বজরপাত/কেমনে যাপি এ তামসী রাত।' আমি সেই ছেঁড়া পাটির উপর চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে ভেসে যেতে থাকি ইন্দ্র সভার দেশে। ১৫.৪.৬৪তে একটা গান লিখি, যার মুখপদ হলঃ 'ওগো সুন্দরী কান্তার কান্তি অনন্যা/ কবি মনোমোহিনী মঞ্জুলিকা– মাধুরীর মঞ্জীর বন্যা।' এই গানের নিচে লিখে দিইঃ ভৈরবী বা রামকেলির সঙ্গে তোড়ির সামান্য ঝাঁঝ মেশাবেন।' তৎসম বাণীপ্রধান এ বন্দনাগানে অদ্ভুত মধুর এক নমনীয় সুর লাগান তিনি। একবার আমার এক বন্ধুর বৌভাতে গাওয়ার জন্যে একটা গান রচনা করি। রাতে সুর করে রাখেন সাধন বাবু। পরদিন সকালে আমি যেতেই এক কান্ড। আমাকে দেখে মিটি মিটি হেসে চোখে খেমটাউলীদের মত আড়কটাক্ষ নাচিয়ে গাইতে শুরু করে দেন, 'দুটি মন/এক হয়ে যায় শংখ সানাই আবীরগুলাল উলুরবে।' সে এমনই এক মজার নাটুনে সুর, পরদিন বাগেরহাটে যাবার পথে ট্রেনের চলার তালে ঐ সুরেরই দুলুনি শুনতে থাকি। বৈট্‌পুরে গ্রামের বাড়িতে যাই ডাব খেতে। ভিটেয় বসেও 'দুটি মনে'র সফরীগুঞ্জরণ। রঙবেরঙের কথা নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট চালাতাম আমরা। ভারী থেকে চটুল, কোনো বালাই ছিল না শুচিবাইয়ের। একদিন লিখলামঃ 'মিন্‌সে আমায় দ্যাখে চেয়ে ট্যারা চোখের চাহনিতে/ইচ্ছে করে নরুন দিয়ে চক্ষু দুটি গেলে দিতে।' এর উপর খেউড়মার্কা সুর বসিয়ে সাধনবাবু আমাকে হাসিয়ে মাতিয়ে একসা করে ছাড়েন। মাঝে মাঝে দু'জনে লেগে যেতো যশোর খুলনায় প্রচলিত স্বল্পপ্রাণ টানের প্রতি তার পক্ষপাত নিয়ে। কখনো বা ছাড়তে চাইতেন না, কখনো বা চাইলেও পারতেন না। 'আমরা ক'জন আধা আধা আধুনিক নাগরিক/ইঞ্চি ইঞ্চি ধুঁকে ধুঁকে স্বপ্ন দেখি সাগরিক' গানটির 'ক'জন' ও 'আধা আধা'তে এই গন্ধ তিনি আমার আপত্তি সত্ত্বেও রেখে দিলেন।

সাধন বাবুর সঙ্গে আমার পরিচয়টা ঘটে বড় রাজনৈতিক কালবেলায়। শুধু তখন কেন, এ দেশের জন্মাবধি সেই ১৯৪৭– এর ১৪ই আগস্ট থেকেই চলেছে ছেদহীন কালবেলার অশৌচ। আমরা তখন আয়ুব খানের সামরিক শাহীতে (১৯৫৮– এর পর থেকে) দিন গুজরান করছি। গোটা ষাটের দশক জুড়ে জনজীবনের সঙ্গী ছিল ব্যাটন, বেয়নেট, বুলেট, বিক্ষোভ, মিছিল, প্রতিবাদ। দেশের আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টি ও পশ্চিমবঙ্গের বামাচারী বন্ধুদের পাঠানো লিটারেচারের তাপে আমার লেখনী তখন বিদ্যুতায়িত হয়ে উঠেছে।

১৯৬৪– এর কথা বলছি। সাধন বাবু একদিন কিছু প্রগতিশীল তরুণ বন্ধুর কথা উল্লেখ করেন। তাঁরা খুলনা শহরে 'সন্দীপন' নামে একটি সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে তুলেছেন অতি সদ্য। আমাকে নিয়ে যাবেন ওঁদের বৈঠকে। পরে একদিন বললেন, আলোর (নাজিম মাহমুদ) সঙ্গে কথা হয়েছে। আগামী ২৭.৯. ৬৪ রোববারে ওঁদের আসর বসছে। আমি যেন চলে আসি বাগেরহাট থেকে। এ সময়টা আমার ভোলার উপায় নেই। কিছু কিছু দিনক্ষণ দাগ কেটে বসে যায় মাংস থেকে হাড়ে। কারণ তার পরের দিনটি অর্থাৎ ২৮.৯.৬৪ সোমবার ছিল আমার জীবনে প্রথম গণসংগীত লেখার অভিষেক। একতোড়ে ছ'টা গান বেরিয়ে এসেছিল কলম দিয়ে ঝড়ের গতিতে। নাকি বুলেটের বেগে। তবে ব্যাপারটির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আগের দিন রোববার ২৭ সেপ্টেম্বর বাগেরহাট কলেজ রেলস্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দুপুর একটার ঝলসানো রোদে। খুলনায় সাধন বাবুর আহ্বানে সন্দীপনে যোগ দেবার উদ্দেশে বেরিয়েছি। কলেজ স্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করছি। চোখ ধাঁধানো রোদ ঝকঝক জ্বলছে রেলের জোড়া লাইন। প্রেম ও রাজনীতিঃ ঐ উজ্জ্বল অসিরেখা ধরে সে আসবে অমোঘ। বায়ান্নোর রক্তরেখা ধরে ধরে। 'কালো কালো খোঁদল/কড়া পড়া হোঁচটগুলো গোনা শেষ করে' ....সমস্ত বিচ্ছেদ ও বেদনার উপান্তে' ....'হেঁটে হেঁটে রক্তাক্ত পায়ে/ছোবল ও তরঙ্গগুলো মাড়িয়ে' ....'ডান হাতের মুঠোয়....আজ এক শপথের চারা/তোমার জন্যে।' প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটি কবিতা তৈরি হয়ে যায়। 'তোমার অনন্ত সান্নিধ্যে' নাম দিয়ে পরে কবি বিষ্ণু দে এটি কলকাতার একটি পত্রিকায় ছাপিয়ে দেন। মনে হয় এটিই আমার সর্বাধিক মুদ্রণধন্য কবিতা। কলকাতার ৭/৮টি পত্রিকায় ও স্বদেশের তিনটে পত্রিকায়, দুই বাংলার বিভিন্ন সংকলন গ্রন্থে, বাইরে হিন্দি, ইংরেজি, চেক, চীনা, হাঙ্গেরী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয়ে বেরিয়েছে। আমার প্রথম কবিতার বই 'ধবল দুধের স্বরগ্রামে' এই কবিতা ছাপা হয় 'শপথের স্বর' নামে।

ঐদিনই সন্ধ্যেয় সাধন সরকার আমাকে খুলনা শহরের যশোর রোডে গান্ধী পার্কের [এখন হাদীস পার্ক] সামনে ফ্লোরা হাউসের দোতলায় নিয়ে যান। ওটাই সদ্য গঠিত প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক সম্প্রদায় 'সন্দীপনে'র অফিস। সেদিন ওঁদের আসরের দিন। ওখানেই প্রথম পরিচয় সংস্কৃতিকর্মী খালেদ রশীদ (গুরু), হাসান আজিজুল হক, নাজিম মাহমুদ, মুস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ ব্যক্তিত্বর সঙ্গে। সে অনুষ্ঠানে হাসান আজিজুল হক তাঁর নতুন লেখা 'আবর্তের সম্মুখে গল্পটা' পড়ে শোনান। আমি তাৎক্ষণিক মন্তব্য করি। পরে নিজের একটি কবিতাও পড়ি।

সন্দীপনের আসর শুরু হয়ে থাকে তাঁদের একটি সম্প্রদায় সঙ্গীত দিয়ে। গানটি নাজিম মাহমুদের লেখা ও সাধন সরকারের সুর দেয়া। সব সদস্য গলা মিলিয়ে গান। তবে সবার উপরে নাজিম মাহমুদ ও সাধন বাবুর ভরাট কণ্ঠ। একটা বোর্ডে বড় বড় হরফে গানের কথাগুলো লিখে সামনে খাড়া করে রাখা হয়েছে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনপিষ্ট একদল বামপন্থী তরুণের ক্ষোভ, দুঃসাহস, প্রতিবাদ, শপথ: সবই ছিল সে গানের কথায়। এই গান আমার অবচেতনে অনুক্ষণ দখল করে রাখে। এছাড়া, নাজিম মাহমুদের কণ্ঠে সাধন বাবুরও অতিরিক্ত একটা রাজকীয় নাদ ছিল, আফ্রিকান ড্রামের মত, যার দ্রিম দ্রিম মেঘমন্দ্র আমার মাথার মধ্যে পিটতে থাকে। আসরের পর হাসান আজিজুল হক তাঁর টুট পাড়ার বাসায় নিয়ে যান। সেখানে দেখা গেল, তাঁর বড় বোন জানু ও স্ত্রী মঞ্জু দু'জনেই বর্ধমানে আমার পূর্ব পরিচিতা। হাসান আজিজুল হক তাঁর নতুন লেখা 'গুনীন' গল্পটা পড়ে শোনান। কিন্তু কিছুতেই মন বসেনি। অসুস্থতার (সাংস্কৃতিক অসুস্থার?) জের নিয়েই ফিরে আসি গভীর রাতে এক নম্বর কাস্টম ঘাটে মেজ বোন জানুদের বাসায়।

পরদিন সোমবার ২৮.৯.৬৪ গত রাতের সেই কালচার‍্যাল হ্যাংওভার সকাল বেলায়ও কাটেনি। রূপসা নদীর তীরে চমৎকার

চলছে →

করেন। ধারা বর্ণনা রচনায় হাসান আজিজুল হক, পাঠে নাজিম মাহমুদ, মঞ্চ পরিচালনায় মুস্তাফিজুর রহমান ও সর্বাঙ্গিন পরিচালনায় খালেদ রশীদ ওরফে গুরু। রিহার্সেল শুরুর আগে তো গানের কথায় সুরারোপের পালা। ২১.৫.৬৫তে সকাল দশটার দিকে ফ্লোরা হাউসের দোতলায় সন্দীপনের অফিস ঘরে। ঢালাও পাটি পাতা। হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গেলেন সাধন বাবু। তাঁর সামনে টুটুল (ফারুখ আনোয়ার)। পেছনে আমি। সাধন বাবু এক–একবার একেকটা নতুন সুর লাগিয়ে গাইছেন 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল।' টুটুল তালে তালে বুড়ো আঙুলে তুড়ি বাজিয়ে সাধন বাবুর সঙ্গে গলা মেলাচ্ছে। আর প্রতিবার আমি প্রচন্ড অস্বস্তিতে ওঁর চওড়া পিঠে দমাদম কিল বসিয়ে চেঁচিয়ে উঠি, আঃ হা! আরে এ না, এ না! আর সাধন বাবু ঠা ঠা করে হেসে উঠে খুলনার খাস বাংলায় বলেন, 'আরে অবে না মানেডা কী? এই নেন তয়, অতিছে...!' নতুন সুরে গেয়ে ওঠেন আবার।

জ্যৈষ্ঠের দুপুরে আগুন জ্বলছে। সাধন বাবু শার্ট খুলে নিয়েছেন। সারা পিঠ বেয়ে দর দর করে ঘাম গড়াচ্ছে। আর সেই চওড়া হলুদ–ফর্সা পিঠে লাল ছোপ পড়েছে আমার কিল চড়ের। এক সময় প্রচন্ড উৎসাহে চড় বসিয়ে চিৎকার করে উঠি আমি, এই তো এই তো! হ্যাঁ হ্যাঁ চালান, চালিয়ে যান। থামবেন না খবরদার। সাধন বাবু হাঁক পারেন, ও টুটুল থা'মে না, থামালি কলম মা'র। ন্যাও ধরো– ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল...।

১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত গণআন্দোলনের সেই আগুনঝরা বছরগুলোয় সারা খুলনা এলাকা সন্দীপন তাতিয়ে রাখে এই গানে। না, ঠিক বলিনি। মনোয়ার ও আরো অনেক নিবেদিতপ্রাণ কর্মীর গানও ছিল। তবে আমার ও নাজিম মাহমুদের লেখা গানই ছিল সংখ্যাধিক। বলা বাহুল্য, সমস্ত নতুন গানের একক সুরকার সাধন সরকার। ১৯৭১–এর ২১ মার্চ রাতে খুলনার হাদীস পার্কে লেখক–শিল্পী–সাংবাদিকদের সম্মিলিত অনুষ্ঠানে ও ২৪ মার্চ রাতে বাগেরহাটে টাউন স্কুল প্রাঙ্গণে শেখ আমজাদ আলী গোরাই মিয়া পরিচালিত গণপ্রতিরোধ কমিটির অনুষ্ঠানে এই গান গাওয়া হয়। তার পরের রাতই ভয়াবহ ২৫ মার্চ গণহত্যা দিবস।

১৯৭১–এর বর্ষাকাল। বাগেরহাটের বৈট্‌পুর গ্রামে আমার বাড়িতে সপরিবারে পালিয়ে আছি। মে মাস। চারদিক জুড়ে বুনো অন্ধকার। বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে বেমরতা– জয়গঞ্জির দিক থেকে এলএমজি–এর ট্যা ট্যা ট্যা রা রা রা গর্জন। মশারীর মধ্যে চাপা গলায় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সংগ্রামী গান শোনাচ্ছে। হঠাৎ চমকে উঠি বলিষ্ঠ কোরাসের শব্দেঃ 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল...।' সবুজ রঙের প্যাই ট্রানজিস্টারটার দিকে তাকিয়ে দেখি, হ্যাঁ, এ গান ওখান থেকেই ছুটে আসছে বটে।

১৯৭১–এর পর। স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রচার কর্তারা এ গানের টেপ মুছে ফেলেন। যেমন মুক্তিযুদ্ধের আরও আরও নিদর্শন ও কুশীলব খুন, জখম ও গায়েব হয়ে গেছেন। তবে অজেয় সাধন সরকার তার আগেই 'ব্যারিকেড বেয়নেটে'র স্বরলিপি নিজের হাতে করে রেখে গেছেন।

কমার্স কলেজের অনুষ্ঠানের হপ্তা দুয়েক পর খুলনা মিউনিসিপ্যালিটি হলে সন্দীপন প্রযোজিত নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানে গীতি নকশা রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয় আমার ওপর। 'এক রক্তাক্ত সৈনিকের উৎসর্গে' নামে এই স্ক্রিপ্টটা লিখে শেষ করি ১২ জুন ১৯৬৫ শনিবারে। এতে 'ব্যারিকেড বেয়নেট' ছাড়াও আগের লেখা 'আমরা ক'জন আধা আধা আধুনিক নাগরিক' ও আরও পাঁচটি নতুন লেখা গানের সব ক'টা গানে সুরারোপ করেন সাধন সরকার। বাকি পাঁচটা গানের কথা প্রথম লাইনগুলি ছিল ঃ 'কোন দুরন্তের জন্ম শুনে কাঁপন লাগে তিনলোকে', 'নবীন চলা হল শুরু', 'বুকের পরে দু'হাত রেখে মাথা তুলে বারেক দাঁড়া,' 'আমি লিখেছি– লিখে রেখেছি' ও 'না–ডেকো না–।'

এভাবেই আধুনিকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত গণসংগীতের স্থায়ী হয়ে দাঁড়িয়ে যায় আমাদের সম্পর্ক। আর এটাই অবধারিত ভবিতব্য ছিল তখনকার দেশকালের প্রেক্ষাপটে। সারা দেশব্যাপী উত্তাল গণআন্দোলন ভাসানী–মুজিবের নেতৃত্বে রাজনীতি ও সংস্কৃতি এক বেণীবন্ধনে গণমুক্তি আন্দোলনে মিলে ঋত্বিকের ভূমিকা পালন করছে। আমার কবিতার স্বরে আগুনের ঝাঁঝ লেগেছে। গানেরও শব্দগুচ্ছ বারুদঠাসা। ঘর সংসারের প্রেমভালবাসা রাজপথের অ্যাসফল্টে এসে ফেটে পড়ছে। সাধন বাবু আমার লেখা গণসংগীতে একের পর এক সুর দিয়ে যাচ্ছেন। আমার নিজেরও আলাদা গণসংগীতের দল গড়ে উঠেছে বাগেরহাটে 'চারণিক'ঃ তারিক, শিবাজী, সঞ্চিতা, মিহিনা, বাবুল, সেলিমদের নিয়ে। সেখানে নিজের লেখা গানে নিজেই সুর দিয়ে শিখিয়ে নিই। এ সময়ে কত গান যে লেখা হয় আর সাধন বাবুও যে কত গানে সুর করেছেন, তার সঠিক হিসের কোনদিন আর উদ্ধার হওয়ার সম্ভাবনা নেই। একাত্তরের তাড়া খেয়ে ছুটোছুটির মুখে কত লেখার পাণ্ডুলিপি যে চিরতরে ফেরারী হয়ে গেছে, তার আর কোনো শুমার নেই। তবে ২৫শে মার্চের গণহত্যা শুরুর ঠিক আগেই ২১শে মার্চ ও ২৪শে মার্চের দুটো অনুষ্ঠানের কথা কোনোদিন ভোলা সম্ভব নয়। ২১শে মার্চ খুলনার হাদীস পার্কে অনুষ্ঠানের কথা একটু আগেই বলেছি। হাসান আজিজুল হকের জরুরী চিঠি পেয়েই একদিনের চারটে নতুন গান লিখে পাঠিয়ে দিই। তার মধ্যে এই তিনটে গান সেদিন গাওয়া হয়ঃ 'বাংলার মাটি অতি দুর্জয় বীর্যের সন্তান সেনানীতে পূর্ণ', 'বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম জ্বলন্ত–জানো কি?' ও 'ওই দ্যাখো দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো/ব্যাটন পেটানো বুলেট বেঁধানো বাংলার ইজ্জত।' 'বাংলার ঘরে ঘরে' গানটির প্রথম অন্তরার মুখপদ হচ্ছে 'বুলেটের বর্ষণে বাংলার মাটি অতি তপ্ত'। হাদীস পার্কে সেই ১৯৭১–এর ২১শে মার্চ রাতে সংগ্রামী শপথে জোটবদ্ধ জনতার সামনে সাধন বাবু হঠাৎ বোমা ফাটানোর মত প্রচন্ড গর্জনে 'বুলেটে'র 'বু' টি উচ্চারণ করেন, মনে হয়েছিল বুঝি চুরমার হয়ে ভেঙে পড়লো গোটা অভিশপ্ত ইয়াহিয়া শাহী। এর ঠিক চারদিন পর ২৩শে মার্চ বাগেরহাটে টাউন স্কুল মাঠে গোরাইদার সার্বিক পরিচালনায় একই ধরনের অনুষ্ঠানের কথাও আগেই বলেছি। ঐ দিনই দুপুরের দিকে পনেরো-টাকা ট্যাক্সী ভাড়া করে খুলনার বন্ধুদের বাগেরহাটে নিয়ে আসি আমি। এঁদের মধ্যে ছিলেন সাধন সরকার, হাসান আজিজুল হক, অমিত রায় চৌধুরী, বিদ্যুৎ সরকার ও গৌরীশংকর। পথের পাশে একটা গাব গাছের আগাপাশতলা নতুন কচি পাতায় সাজ দেখে খুশিতে 'নওশা' 'নওশা' ক'রে চেঁচিয়ে ওঠেন সাধন বাবু। বাগেরহাটে পৌছানোর পর টাউন ক্লাবের গ্রীনরুমে বসে শিশুর দোকানের সন্দেশ চাখতে চাখতে গীতি নকশার স্ক্রিপ্টটা লিখে ফেলেন হাসান আজিজুল হক। আর সাধন বাবু বসে যান আমার তাৎক্ষণিকভাবে লেখা একাংকিকার গানে সুর করতে। পান চিবুতে চিবুতেই 'চাই–চাই–চাই–চাই রাজবন্দীদের মুক্তি চাই' গানটিতে 'দুর্গা মাঈ কী জয়' স্লোগানের আদলে সুর করে ফেলেন তিনি। সাধন বাবুর খুলনায় ফিরে যেতে যেতে পরদিন বিকেল ঘুরে যায়। আমার কলেজ রোডের বাসাটিতে দিনভর রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে সম্মোহিত করে রাখেন সবাইকে। তার একদিন পরই ২৫শে মার্চের সেই কালরাত্রি।

আমার যে সব গণসংগীতে সাধনবাবু সুর দিয়েছেন, তাদের মোটামুটি চারটে শ্রেণীতে রাখা যায়ঃ

(ক) গণআন্দোলন

উল্লেখযোগ্য গানঃ 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল', 'ড্রাগনের বহ্নিবিষ হল্কায়', 'আমরা ক'জন আধা আধা আধুনিক নাগরিক', 'ঐ দ্যাখো দ্যাখো চেয়ে দ্যাখো', 'বাংলার ঘরে ঘরে সংগ্রাম জ্বলন্ত–জানো কি', 'আমাদের সংগ্রাম চলবে–থামবে না', 'সংগ্রাম সংগ্রাম', 'বাংলার মাটি অতি দুর্জয় বীর্যের সন্তান সেনানীতে পূর্ণ', 'চাই চাই চাই– চাই রাজবন্দীদের মুক্তি চাই', 'শোনেন শোনেন ভাইগণ', 'হোই আইনুল

চলছে →

ভাই জয়নুল ভাই কই গেলিরে' ইত্যাদি।

(খ) মুক্তিযুদ্ধের গানঃ

'বলো জয় বাংলা বাংলার জয়', 'গেরিলা বাংলা ওওযোদ্ধা', 'বিদ্রোহী বঙ্গোপসাগর তরঙ্গে', 'লক্ষ মানুষ যদি গর্জে ওঠে', 'ওরা নতুন ইহুদী', 'মনে পড়ে যায়' ইত্যাদি।

(গ) একুশের গান

'বাংলা আমার দুঃখ সুখের সাথি মধুর ভাষা', 'একুশে নিয়েছি শপথ ভাই', 'চলো ভাই চলো যাই শহীদের মিনারে', 'ভালবেসেছিল ওরা', 'বলো বাংলাদেশের মানুষ তোমরা বলো' ইত্যাদি।

(ঘ) দেশের গান

'যদ্দুর চোখ যায় রোদ্দুর', 'বাতাস আমায় গুণ করেছে', 'একটি নতুন দেশ বাংলাদেশ' ইত্যাদি।

সাধন সরকার আমার লেখা প্রচুর গণসংগীতে সুর করলেও ঘটনাক্রমে তথা সৌভাগ্যক্রমে 'ব্যারিকেড বেয়নেট বেড়াজাল' গানটি একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত হওয়ার ফলে পরবর্তীকালে তাঁর ও আমার মুখ্য পরিচিতি হয়ে দাঁড়ায় এই গানের সুরকার ও গীতিকার হিসেবে। অপচারের তলায় আড়াল ঝড়ে যায় আমাদের আরো আরো সব সফল গণসংগীত।

একাত্তরোত্তর খুলনায় সন্দীপন করে যায়। নাজিম মাহমুদ বহু আগে থেকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। ওরু মুক্তিযুদ্ধে শহীদ। হাসান আজিজুল হক তিহাত্তরে ও আমি চুয়াত্তরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসি। বেশ কিছু পরে সবেধন নীলমণি মুস্তাফিজ মারা যান। সাধন বাবুর সঙ্গে আমার গানের লেনাদেনা ফিকে হয়ে আসতে থাকে। সৃষ্টির প্রথম পালাটা ওরু হয়েছিল কোনো রকম লক্ষ্য উপলক্ষ ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্ত প্রণোদনায়। এরপর দেশ, জনগণ ও সময়ের দাবিতে বড় হয়ে ওঠে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আপাতঃলক্ষ্যটা প্রত্যক্ষত সিদ্ধ হল ১৯৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে। তবে কি না, আমরা রুশ বিপ্লবের মত গণবিপ্লব হাসিল করে বসিনি। তাই মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধারা অনন্তর খারিজ হয়ে যেতে থাকে আলোকের তালিকা থেকে। পুরস্কার ও সান্ত্বনার নামে এইটুকু প্রেফ,- 'শব্দ সৈনিক' নামে একটি নব উদ্ভূত শব্দের ঠাঁই লাভের দূর সম্ভাবনা দেখা দেয় আমাদের ভবিষ্যৎ বাগধারা অভিধানের পাতায়। লক্ষ্য মিটে গেলে পর উপলক্ষের সূত্র ধরে যদিচ আমাদের সম্পর্কের সাঁকোটা খাড়া থাকে। একটা উপলক্ষের কথা এখুনি মনে পড়ে যাচ্ছে। খুলনা রেডিও'র আর ডি. অত্যন্ত সজ্জন মফিজুল হক সাহেব (এখন ঢাকা কেন্দ্রের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে কর্মরত) বর্ষা ঋতুর উপর একটি স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে বলেন। সাধন সরকারকে দিয়ে সুর করাতে হবে এই শর্তে আমি ২৮.৬.৮৩তে আটটি গান সহ এই স্ক্রিপ্টটা লিখে দিই। তখন চোখের পীড়া ও ডায়াবেটিসে ভুগতে থাকা সাধন বাবু আমার রচনা পাওয়ার আনন্দে প্রাণ দিয়ে গানগুলিতে সুর করেন। আমি খুলনা গেলে মফিজ সাহেব নিজে আমার সঙ্গে মীর্জাপুর রোডের বাসায় গিয়ে তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। গানগুলির মুখপদ ছিলোঃ 'এই তো দখিনা ছিল একটু আগে' 'তালপুকুরে পিতলঘটি ডোবে না ডোবে না হায়', 'একঝাঁক ঝড় এসে চলে যায়', 'তোমার দু'চোখে আজ/সর্বনাশের ভাষা কথা কয়', 'কেঁদো না গৌরী ও সই তৃষাতুরা জলউপোসী' 'উদাসী অশথে ওঠে দীর্ঘনিশ্বাস', 'ছিল সে/জীর্ণ অতি শীর্ণমতি সোঁতের ধারা', 'ঘুমন্ত/ পৃথিবী মরণঘুমে রয়েছে মরে' এবং 'ও-ও-ও-/এতদিন খরায় পুড়ে মরেছি কী আগুনজ্বালা।' সাফল্যের উৎসাহে মফিজ সাহেব, এবার আমাকে হেমন্তের উপর স্ক্রিপ্ট লিখে দিতে বলেন। মোট ন'টি গানে গীতি নকশাটি সাজিয়ে দিই। সুরকার সাধন সরকার। খুলনা রেডিও থেকে ১১.১২.৮৩তে এটি প্রচারিত হয়। গানগুলির প্রথম কলিঃ 'ফিক করে হেসে ওঠে পথটি' 'জল চিক চিক থলকমলের পাতায় ছিল অঢেল আলো', 'সেদিন চলতে পথে/হঠাৎ

চলছে →

থমকে নেমে যেতে হল', 'রাত ঝড়ে—অগ্রিম হিম নামে/কার্তিকের গর্ভিনী ধানক্ষেতে', 'একমাঠে একবুক ধানসোনা ভালবাসা' ও 'কংকালে মরা ডালে' ফোটে ফুল ফোটে গো।'

সাধন বাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা অনাবিল প্রীতি বন্ধনেই স্বস্তিময় ছিল শেষ পর্যন্ত। গ্রন্থির সীমা ডিঙিয়ে বিষয়বুদ্ধির ধান্দাবাজীতে লিপ্ত হবার প্রবৃত্তি আসেনি কখনো। সবচেয়ে বড় কথা, আমরা একে অন্যকে ব্যবহার করার প্রয়োজন বোধ করিনি। ১৯৮৪ সালের ৭ অক্টোবর দুপুরবেলা সলিল চৌধুরী তাঁর 'আকাশদীপ' ফ্ল্যাটে বসে কথায় কথায় আমাকে প্রস্তাব দেন, সাধন বাবুর সুর দেয়া আমার গণসংগীতগুলো অবিকৃত সুরে ক্যাসেট করে (অর্থাৎ টেপে রেকর্ড করে) তাঁকে পৌঁছে দিতে পারলে, তিনি তাঁর সিএমআর স্টুডিও থেকে এল.পি ডিস্ক বের করে দেবেন। সাধন বাবু আমাকে সতেরোটি গানের একটি টেপ নিজের গলায় রেকর্ড করে দেন অসুস্থ অবস্থায়। এমনকি, পরে নিজের হাতে বিশটি গানের স্বরলিপিও কষ্ট করে তৈরি করে দেন কিন্তু আমারই নিরুদ্যম ঔদাস্যের কারণে সে টেপ আর সলিল চৌধুরীকে পৌঁছে দেয়া হয়নি। ১৯৯৩—এর সেপ্টেম্বর মাসে এক বৃষ্টিধোয়া সন্ধেরাতে শেষ পর্যন্ত ঐ টেপ; স্বরলিপি ও আমার গণসংগীতের খাতা নিয়ে যখন আমি 'আকাশদীপে'র গেটে পৌঁছুই, সলিলবাবুর গাড়ি তখন আমার নাকের ডগার ওপর দিয়ে হুউশ করে বেরিয়ে উড়ে যায়। গেটের দারোয়ানরা জানায়, তিনি অনেক দিনের জন্যে বম্বে চলে গেলেন। ব্যস। তারপর তো এই পঁচানব্বইয়ের সেপ্টেম্বরে সলিলবাবু একেবারেই সংসার ছেড়েছুঁড়ে চলে গেলেন। আর, সাধনবাবু তো আগেই বিদায় নিয়ে গেছেন। সবচেয়ে কষ্ট লাগে ভেবে, এই গানগুলি ক্যাসেট আকারে ও স্বরলিপিসহ বই আকারে বের করার জন্যে অদ্যাবধি না খোশামোদ করেছি কাকে! কিন্তু কেউ এগিয়ে আসেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস সংরক্ষণ ও রচনা করার জন্যে সরকারী—বেসরকারী নানা পক্ষের নানা বহুবারম্ভের শোরগোল শুনতে পাই হামেশা অথচ আমাদের খোলা চোখের উপর দিয়েই কত মূল্যবান উপাদান ও উপকরণ চিরতরে ভেসে মুছে হারিয়ে যাচ্ছে! আত্মবিস্মৃতিই হয়তো আমাদের জাতীয় সম্পদ!

খুলনা শহরের চৌখুপীতে সাধনবাবুর মত বড় মাপের প্রতিভা ও ব্যক্তিত্ব কী কষ্টকরভাবে এঁটে আছে, ভেবে কষ্ট পেতাম। তাঁর অসাধারণ কণ্ঠসৃষ্টি জানাতে ইচ্ছে করতো প্রিয়জনদের। আমার বোন ফতু(ফাতেমা) একবার বিদেশ থেকে দেশে বেড়াতে আসে (ওর স্বামী রুহুল আমীন তখন কাতার দূতাবাসে চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স)। ওকে নিয়ে যাই সাধনবাবুর বাসায়। তাঁর গান শুনে বেচারী কেঁদেকেটে একাকার। সাধনবাবুর কণ্ঠে রবীন্দ্র সংগীত শুনে আমার স্ত্রী আনুরও সেই দশা। একবার আমার ব্রিটিশ জামাই পিটারকে নিয়ে ওই স্কুদে কামরায় ঠান্ডা পাটির উপর ঘন্টাখানেক ঠায় বসিয়ে রেখে সাধনবাবুর গান শোনাই। সেই স্বল্পবাক সাহেব মানুষটি বিদায় নেবার সময় সাধনবাবুর হাতে হাত দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে, 'ইউ আর এ গ্রেট আর্টিস্ট!'

তাঁর আচার—আচরণ, বন্ধুত্ব ভালবাসা সব কিছুর মধ্যে একটা অকপট ব্যক্তিত্ব প্রচ্ছন্ন থাকতো। মনে পড়ে, একবার কোন এক বড় অনুষ্ঠান থেকে কিছু ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমাকে নিঃশব্দে বাদ দেন। সাধন বাবু তীব্র আঘাত পান এই অপব্যবহারে। একটা মর্মান্তিক চিঠি লিখে আমার ক্ষতে প্রলেপ দিতে চেষ্টা করেন। সেই নিঃস্বার্থ পত্রটি এখনও রয়ে গেছে আমার কাছে।

১৯৭১—এর নরমেধযজ্ঞ শুরু হলে বাবা, আমি ও আনু বাগেরহাটে বসে তিনটি মানুষের জন্যে খুব উতলা হয়ে পড়ি। এঁরা হলেন, গুরু (শহীদ খালেদ রশীদ), হাসান আজিজুল হক ও সাধন বাবু। গুরু তো আগে থেকেই আন্ডারগ্রাউন্ড রাজনীতিতে ঢুকে গেছেন। ১৯৭০—এর ৬ অক্টোবর বুধবার শবে—বরাতের রাতে শেষ তিনি বাগেরহাটে আমার বাসায় ক্যুরিয়ারের মারফত খবর দিয়ে খুব গোপনে এসে খাওয়া—দাওয়া করে চলে গেছেন। তারপর ডুমুরিয়ার ফ্রন্টে যুদ্ধাবস্থায় ধরা পড়ে শহীদ হন। আর দেখা হয়নি আমার সঙ্গে। হাসান আজিজুল হক ১৯৭১—এর ২রা এপ্রিল সপরিবারে খুলনা থেকে বাগেরহাটে আমার কাছে চলে আসেন। কিন্তু সাধনবাবুর ভালমন্দ কোনো খবরই যোগাড় করে উঠতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি একটু ফর্সা হতেই আমার ৬৭/৬৮ বছরের বৃদ্ধ বাবা নিজে খুলনায় মীর্জাপুর রোডে গিয়ে সাধনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন ও তাঁর কুশল সংবাদ বয়ে নিয়ে আসেন। স্বাধীনতার পর এই খবরটুকু সাধনবাবু যে কতজনকে কৃতজ্ঞ ভাষায় বয়ান করে শুনিয়েছেন, তা বলার নয়।

একবার আমার শ্রদ্ধেয় সখা কবিয়াল বিজয় সরকারকে সাধনবাবুর কাছে বেড়াতে নিয়ে যাই। মনে ভয় ছিল পাছে গ্রাম্য কবিয়ালকে তিনি উপেক্ষা দেখান। কিন্তু স্বস্তির সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, দুই শিল্পী পরস্পরের সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করছেন। সাধনবাবু সেদিন অনুরোধের অপেক্ষা না রেখেই কবিকে অনেকগুলো শ্যামা সংগীত ও কয়েকটি রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে শোনান। উত্তরে বিজয়বাবু প্রথমেই ধরেনঃ

'নিজে গেয়ে নিজে শুনিস নিজের গান।
তোর গান তোর মনমত হলে
জুড়াবে সগলার প্রাণ।'

এরপর গাইলেন তাঁর নিজের অতিপ্রিয় দু'টি গানঃ

'কি সাপে কামড়ালো আমায় রে সাপুড়িয়া
জ্বলিয়া পুড়িয়া মইলাম বিষে।
আমার বিশ শুনে জ্বলছে এই বিষ, জুড়াইব কিসে।'

ও

'ওরে বড় ব্যথা দিয়ে গেলি রে পরানে
পর কাঁদানো পরবাসিয়া।
আমি কী ছিলাম আর কী হয়েছি
বন্ধু তোরে ভালবাসিয়া।'

সাধনবাবু খুলনার মানুষের কাছ থেকে ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রচুর পেয়েছেন। কিন্তু দেশ তাঁর প্রতিভার যথাযোগ্য স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিন্দুকল্প হলেও তো কৃতজ্ঞ তাঁর প্রতি। কিন্তু স্বাধীনতা পাওয়ার পর যখন উপযুক্ত মুক্ত বাতাস এসে গেল, তখনো উপেক্ষিত—বিস্মৃত খুলনার সাধন সরকার। ১৯৭২—এর মার্চ মাসে আমি জাতীয় সংস্কৃতির স্বার্থেই তাঁকে ঢাকায় তুলে আনার জন্যে বন্ধু কামাল লোহানীর কাছে আবেদন জানাই। লোহানীও আন্তরিকভাবে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উপস্থিত এক বয়োজ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট গণসংগীত শিল্পী উদ্বেগে না না করে হাহাকার করে ওঠেন। তিনি যুক্তি দেন, 'সাধন খুলনা ছেড়ে এলে খুলনা কানা হয়ে যাবে'। অথচ তিনি নিজেও মূলত ঢাকায় বহিরাগত অভিবাসী। সাধনবাবুকে প্রথম আনুষ্ঠানিক সংবর্ধনা দেয় খুলনার সন্দীপনই। তারপর ঢাকার ক্রান্তি গোষ্ঠী। কিন্তু যে অসহ রোগযন্ত্রণা ও অর্থদৈন্যের মধ্য দিয়ে তাঁকে বিদেয় নিতে হয়েছে পৃথিবী থেকে, তা ভুলি কী করে? কৃতজ্ঞতা জানাই মাহমুদ হাসানের দরাজ দিল ও সেবা ধর্মকে। খুলনার অনুরাগীরা সাধন সরকার—সহায়তা কমিটি গঠন করেন। বাজারে কুপন ছাড়েন। ফান্ড তৈরি করেন। কিন্তু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় মফস্বল নিবাসী এক শিল্পীর জন্যে এতটুকু সহমর্মিতা প্রদর্শনের প্রয়োজন বোধ করেনি। তাঁর প্রথম মৃত্যু দিবসে খুলনার গণশিল্পী সংস্থা উমেশচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরীর দোতলায় শোক সভার আয়োজন করে। সেখানে আমরা অনেকে মিলে বক্তৃতা করি। খুলনার মেয়র সাহেব নানারকম প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু অনুরুদ্ধ হয়েও দীপা ব্যানার্জী বক্তৃতা করা থেকে বিরত থাকেন। কারণ তিনি জানতেন, বক্তৃতা ও প্রতিশ্রুতির বহুবাক্ষোটধ্বনি বাংলাদেশের নোনা বাতাস দ্রুত শোষণ করে নেয়। সাধন সরকারের উত্তরসূরী হিসেবে এদেশের দেশপ্রেমিক নতুন প্রজন্মকে কিছু বিষয় নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

১৬.৯.৯৫

অসমাপ্ত